১ম খণ্ড

পঁচাত্তর থেকে শাপলা

মনযূর আহমাদ

প্রকাশনায়
কাতেবিন প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৭৬ ৫৯৯৩২৪

প্রথম কথা

ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা

এই বিষয় ও শিরোনামের বই লেখা আমার মত নগণ্য লোকের পক্ষে এক প্রকার দুঃসাহস এবং ধৃষ্টতাও বলা যেত পারে। তাই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অপেক্ষায় ছিলাম, কেউ লিখবে। কেউ লিখছে না। তাই লিখতে বসেছিলাম। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এগুচ্ছিলাম। শেষমেস যা দাঁড়ালো তার নাম দিয়েছি 'পঁচাত্তর থেকে শাপলা'। 'শাপলা' আমাদের নিকট ইতিহাসের একটি বড় নোক্তা। আজ জাগ্রত চেতনা ও চেতনা জাগানিয়ার অপর নাম 'শাপলা'। শেষমেস বইটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে কিছুটা নির্ভার মনে করছি।

আমি দেখি, এই ভূখণ্ডের জনমণ্ডলী কী যেন হারিয়ে সর্বক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং তাদের চোখে-মুখে মলিনতা লেপ্টে আছে। হয়ত নেতা ও নেতৃত্বের অভাবে তারা মাথা নিচু করে আছে। বার বার স্বপ্ন ভঙ্গের কারণে তারা স্বপ্ন দেখতেও যেন ভয় পাচ্ছে। আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও বহুদিন থেকে বিভিন্ন কৌশলে ভুলিয়ে দেওয়ার পায়তারা চোখে পড়ছে। ফলে নিজেদের মাঝে বহু ধারা ও মত-পথের সৃষ্টি হয়েছে। নিজস্বতা হারানো কোন জাতি কীভাবে অপরের ক্রিড়নকে পরিণত হয় এই সময় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

এইসব ভাবনা ও দুর্ভাবনা থেকে এই সময় ও সমাজ সম্বন্ধে কিছু আলাপ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে শাপলা-শাহবাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

এই বইয়ে গত পঞ্চাশ বছরের রাজনীতির ধারায় কিছু প্রশ্ন কিছু জবাব ও কিছু বয়ান পেশ করা হয়েছে। এই বইয়ে রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সমান গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশেষত এই সময়ে কীভাবে এই জাতির বিশ্বাস, মনন ও মূল্যবোধ আহত, আক্রান্ত ও উপেক্ষিত হচ্ছিল সে বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টাসহ এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় ও উপাদানগুলো উপস্থাপন করার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যাবে।

তবে সবটুকু রাজনৈতিক আলাপ নয়। বিষয় সূত্রে বিশ্লেষণ অনেক। সবচেয়ে বড় কথা, জাতি যে ঐতিহ্যিক পরিচয় হারাচ্ছিল এবং তাদের প্রতিপক্ষের কাছে হেরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল- এই বইয়ের বাঁকে বাঁকে তারই বিবরণ বিবৃত হয়েছে। এই সময়ে মুসলিমের ঈমান রক্ষার চেষ্টা কেমন ছিল এবং তা কীভাবে সম্পাদিত হয়েছে, প্রতিপক্ষকে কীভাবে মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই আলোচনা বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়েও উপস্থাপিত হয়েছে। আশাকরি এই বই সবাইকে আশাবাদী ও আশ্বস্ত করবে।

দুঃখের বিষয়, আমরা এমন এক সময় যাপন করছি যখন সত্য প্রকাশ করতে নিজেদের বেশ অনিরাপদ মনে করি। তবুও সত্য বলতে চেয়েছি এবং তা নিজের মত করে বলেছি। শেষমেস বইটি নিজের প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করতে পেরে স্বস্তি অনুভব করছি। 'নাবিক' এখন একটি পরিবার। আমরা যেন সফল হই, সকলের কাছে এই দোয়া কামনা করি।

দুঃখের সাথে বলছি, দশ বছর আগের ইতিহাস, তারও অনেক কিছু মানুষ ভুলে যাচ্ছে! তাই আপনাকে শাহবাগি অনাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। আল্লাহ আমাদের জিকির করতে উৎসাহিত করেছেন। জিকির মানে স্মরণ। পবিত্র কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইতিহাস। অতীতের কথা ও ভবিষ্যতের কল্পনা। আপনি যদি অতীত ইতিহাস রক্ষা ও ভবিষ্যৎ কল্পনা ও পরিকল্পনা করতে না পারেন, তবে আপনি নিশ্চিত হেরে ও হারিয়ে যাবেন। এই বোধ ও বিশ্বাস থেকে প্রাণীত এই প্রয়াস। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মনযূর আহমাদ
১৬, ৭, ২০২৩ খ্রি.

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

- **বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধকালের পর । ১৫**
  - স্বাধীনতার পর ইসলামি রাজনীতি চর্চার সূচনা । ২৭
  - বঙ্গে ইসলামি রাজনীতি চর্চার সূচনা । ৩৬
  - জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ । ৪৮
  - জামায়াত ও বাংলাদেশের রাজনীতি । ৪৮

- **জামায়াতের রাজনীতি মাওলানা মওদুদির চিন্তা ও প্রবণতা । ৫১**
  - ইসলামপন্থা থেকে জনতুষ্টির প্রবণতা । ৫৬

- **'ইসলামি রাজনীতি'র সংকট । ৬৪**
- **ইসলামপন্থিদের রাষ্ট্রচিন্তার সীমাবদ্ধতা । ৭৭**
- **বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতির উত্থান । ৮৪**
- **বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন : ইসলামি রাজনীতির নতুন অধ্যায় । ৮৮**
  - মূল চিঠি : প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি । ৯১
  - জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের প্রতি । ৯৯
  - পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের প্রতি হাফেজ্জী হুজুর রাহ.-এর চিঠি । ১০৬

- **বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন : প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য ও কর্মনীতি । ১১০**
  - তওবার রাজনীতি । ১১৪

- ভাস্কর্য বিরোধী আন্দোলন । ১৯৯
- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়ার প্রতি সমর্থন । ২০১
- দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন । ২০২
- সংসদীয় রীতির পরিবর্তন । ২০৩
- আলিয়া মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন । ২০৫

এরশাদের শাসনামল । ২০৬

খালেদা জিয়ার শাসনামল । ২০৮

বাবরি মসজিদ লংমার্চ । ২১০

- লংমার্চ হত্যাকাণ্ড ঘনীভূত রহস্য অনেক প্রশ্ন । ২১৫
- তথাকথিত সর্বদলীয় সভা । ২১৫
- ভারত কর্তৃক প্রশংসাবার্তা প্রেরণ । ২১৬
- সহিংসতার মিথ্যা অপবাদ । ২১৬
- লংমার্চ সম্পর্কে সরকারের উদ্ভট সংখ্যাতত্ত্ব । ২১৮
- টেলিভিশনে মিছিলের খবর ব্লাকআউট । ২১৮
- রহস্যের আবরণে আবৃত লংমার্চ হত্যাকাণ্ড । ২১৯

তসলিমার রাষ্ট্রদ্রোহী-ধর্মদ্রোহী বিরোধী আন্দোলন । ২২১

- আরমানের শাহাদাত এবং স্মরণকালের সর্বাত্মক সফল হরতাল । ২২৯

নারীবাদের ঘটের খবর । ২৩৩

শেখ হাসিনার শাসনামল । ২৩৯

- এনজিও-র ধর্মবিদ্বেষী কার্যক্রমের প্রতিবাদ । ২৪০
- ফতোয়া নিষিদ্ধের রায় বিরোধী আন্দোলন । ২৪২
- সংশ্লিষ্ট ফতোয়ার ঘটনা । ২৫৬
- দুই বিচারপতির রায়ের বিভিন্ন অসংগতি । ২৫৯
- রায়ের বিভিন্ন অসংগতি । ২৫৯
- তালাক কার্যকর হওয়া । ২৬০
- সাইফুল-শাহিদার পুনঃবিবাহ । ২৬২
- ফতোয়ার অর্থ । ২৬৪
- ফতোয়া নিষিদ্ধ । ২৬৫
- সাইফুল-শাহিদা বিচ্ছেদের মামলায় আলেমসমাজের ওপর আক্রমণ । ২৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

- **ভারতবর্ষের আলেমদের ধারা । ৩১১**
  - আলেম-ওলামা : ঐতিহ্যবাদী ধারার বিকাশ । ৩১২
  - ইসলামি চিন্তার 'নন-ট্রাডিশনালিস্ট' ধারা : তাঁরাও দেওবন্দেরই ফসল । ৩১৪
  - 'নন-ট্রাডিশনালিস্ট' ধারা : ব্রিটিশ ভারত । ৩১৬
  - পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তান আমল । ৩১৭
  - ভারত ও পাকিস্তান আমলের কয়েকজন 'নন-ট্রাডিশনালিস্ট' আলেম । ৩১৮
  - কওমি শিক্ষার মানহাজ : পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে । ৩২১

- **কওমি মাদরাসার রাজনীতি । ৩২৩**
- **কওমি মাদরাসা ও জাতীয়তা । ৩২৯**
- **সামাজিক পুঁজি ও দারিদ্র্য-বিমোচনে কওমি মাদরাসার ভূমিকা । ৩৩৩**
  - সামাজিক পুঁজি কী? । ৩৩৩
  - কওমি মাদরাসা কেন্দ্র করে সামাজিক পুঁজির বিকাশ । ৩৩৪
  - কওমি মাদরাসার সঙ্গে এনজিওর তুলনা কেন? । ৩৩৬
  - মাদরাসা ও এনজিও, উভয়ে দানের অর্থে চলে । ৩৩৭
  - বলা হয়, জিডিপিতে এদের অংশ নেই । ৩৩৮
  - পরিচালন ব্যয় । ৩৩৮
  - মাদরাসা কীভাবে সামাজিক পুঁজিকে সামাজিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে পারে । ৩৩৯

- **ইসলাম বিষয়ে নবীন চিন্তকদের বিভিন্ন ধারা । ৩৪১**

- **কওমি ধারার আরেকটি সংগঠন তাবলিগ জামাত : উদ্ভব বিকাশ ও দর্শন । ৩৪৭**
  - দেশভাগ ও তাবলিগ জামাত । ৩৫৪
  - বাংলাদেশে তাবলিগ জামাত । ৩৫৫

- **বিশ্বদরবারে তাবলিগ জামাত । ৩৫৭**
  - ৮০ কোটি মানুষ তাবলিগ জামাতের সঙ্গে যুক্ত । ৩৫৭
  - ইউরোপে তাবলিগ জামাত । ৩৬০
  - তাবলিগ জামাতের ইউরোপের কেন্দ্র-যুক্তরাজ্য । ৩৬১
  - উত্তর আমেরিকায় তাবলিগ জামাত । ৩৬৭
  - আফ্রিকায় তাবলিগ জামাত । ৩৬৯
  - আরো কিছু কথা । ৩৭৩
  - যে কারণে তাবলিগ জামাত এত জনপ্রিয় । ৩৭৪
  - যুক্তরাজ্যের ৭৯৭টি মসজিদ স্থাপিত হয়েছে দেওবন্দিদের মাধ্যমে । ৩৮০

- **দরসে নেজামিয়া : উপমহাদেশের মুসলিমদের শিক্ষার মৌলধারা । ৩৮২**
  - আলিয়া মাদরাসা । ৩৮২
  - যেভাবে আলিয়া শিক্ষা পাশ্চাত্যধারায় প্রভাবিত হয় । ৩৯৯
  - বাদশাহ ফয়সল ইনস্টিটিউট । ৪০৫
  - স্কুল অব ইসলামিক রিসার্চ এণ্ড এডুকেশন । ৪০৮
  - স্কুল অব ইসলামিক রিসার্চ এণ্ড এডুকেশনের কৃতিত্ব । ৪০৮

- **আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য । ৪১১**
  - পাকিস্তান আমল । ৪১১
  - পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা কমিশন । ৪১২
  - বাংলাদেশের শিক্ষা । ৪১৩
  - শিক্ষার কিমাকার প্রকৃতি । ৪১৩
  - প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাণক্যচাল । ৪১৪
  - শিক্ষার লক্ষ্যহীনতা । ৪১৭
  - বিদেশি শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে সরকারের অথর্বতা । ৪১৭
  - বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ : সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ । ৪১৭
  - মানুষের সংজ্ঞা ও পরিচয় । ৪১৮
  - শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ । ৪১৯
  - পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সমন্বয় সাধন । ৪২০
  - বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিধি । ৪২২

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধকালের পর

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (মাহমুদ-হাজারভি) সক্রিয় ছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাংবিধানিক মূলনীতি (ধর্মনিরপেক্ষতা) ও বিধানের আওতায়[১] 'ধর্মসংশ্লিষ্ট ও ধর্মভিত্তিক সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী নিষিদ্ধ হওয়ায়' ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যে কারণে এই সময়কালে কোনো ইসলামি রাজনৈতিক দলের তৎপরতা লক্ষ করা যায় না। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদটি ছিল এমন :

'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য—

ক. সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা
খ. রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান
গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার
ঘ. কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।'

এ অনুচ্ছেদটির নাম দেওয়া হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা'[২]।

---

১. সংবিধানের বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ নং ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাংশ।

২. বাংলাদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি রাজনৈতিক বলয়ে পহেলা নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৭২ সালে। আমাদের তখনকার সংবিধানে 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি'র ৮ (১) —ধারায় বলা হয় : 'জাতীয়তাবাদ,

এর পর ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই সরকার রাজনৈতিক দলবিধি (পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন্স-পিপিআর) ঘোষণা করে।

এই রাজনৈতিক দলবিধিতে ছিল :

১. বিদেশি সাহায্য ও সহযোগিতায় কোন দল গঠন, সংগঠন বা আহ্বান করা যাবে না; এমনকি কোনো ব্যক্তি এ ধরনের দলের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্কও রাখতে পারবে না।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কোনোরূপ প্রচারণা ও আপত্তিকর কার্যকলাপে লিপ্ত কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না।

৩. প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে দলীয় তৎপরতা শুরু করার পূর্বে এই দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, গঠনতন্ত্র, কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, দলীয় তহবিলের উৎস, জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানকল্পে দলের পরিকল্পনা সংবলিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পেশ করতে হবে।

৪. সকল প্রকার গোপন কার্যকলাপ ও সশস্ত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দলের কোন সশস্ত্র বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বা অনুরূপ কোন সংগঠন থাকতে পারবে না।

৫. সকল রাজনৈতিক দলকে আদায়কৃত চাঁদা, প্রাপ্ত সাহায্য ও দানের রসিদ প্রদান করতে হবে এবং দলীয় তহবিল সরকার অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।

৬. কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোনোরূপ ব্যক্তিপূজার উদ্রেক বা ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য প্রচার বা বিকাশ নিষিদ্ধ করা হয়।

৭. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রেও কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে পূর্বাহ্নে কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় পেশ না করে কোন রাজনৈতিক দল কোন প্রকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

৮. রাজনৈতিক দলবিধি অমান্যকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই শাস্তি সম্পত্তি ও তহবিল বাজেয়াপ্তসহ দলটিকে

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাসপেন্ড হতে শুরু করে সম্পূর্ণ বিলোপ করা যাবে।

৯. সরকার ইচ্ছেমতো সময় সময় নির্দেশ জারি করে যেকোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

১০. সাময়িকভাবে বলবৎ অপরাপর আইনসমূহে যা-ই থাকুক না কেন তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলবিধির কার্যকারিতা ঠিক থাকবে।[৫]

রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর) ঘোষণা করার পর রাষ্ট্রপতি সায়েম অপর এক ঘোষণায় বলেন, ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে পুনরায় দলীয় কর্মকাণ্ড শুরু হবে।

স্বাধীনতার পর ইসলামি রাজনীতি চর্চার সূচনা

এই ঘোষিত রাজনৈতিক দলবিধিতে ধর্মভিত্তিক বা ইসলামপন্থি দল গঠনে কোনো বাধা না রাখা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। রাজনৈতিক দলবিধি জারির পর ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ একটি দলের আওতায় ঐক্যবদ্ধ হবার বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হন। নিষিদ্ধ দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী সর্বাধিক সংগঠিত দল ছিল। দলটির জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ঢাকায় ১৯৭৬ সালের ৫ ও ৬ আগস্ট একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলটির শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ৯৩ জন প্রতিনিধি দলীয় কার্যক্রম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে ৬ জন 'জামায়াতে ইসলামী'র নামে কার্যক্রম পরিচালনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন এবং অবশিষ্ট ৮৭ জন অন্যসব নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামি দলগুলোর সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামি দল গঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তাতে একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামি দল গঠনের পক্ষে কনভেনশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমঝোতার ভিত্তিতে ঢাকায় এডভোকেট শফিকুর রহমানের বাড়িতে সাতটি ইসলামপন্থি দলের ঐক্যের সনদ স্বাক্ষরিত হয়। সনদটিতে বলা হয় :

---

৫. এম এ ওদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*; ঢাকা, রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা : ১৩৯-১৪০

এরপর তিনি আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখানে মিশকাত জামায়াত (স্নাতক) সমাপ্ত করে ১৯২৬ সালে মাজাহিরুল উলুম, সাহারানপুরে চলে যান। এখানে তিনি দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন এবং তাফসির ও ইসলামি আইনের উচ্চতর বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৯ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে তিনি আরও উচ্চতর পড়াশোনা করেন।

মাজাহিরুল উলুম, সাহারানপুরে অধ্যয়নকালে অসুস্থতার কারণে একবার দ্বিতীয় হওয়া ব্যতীত ছাত্র জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরের বার্ষিক পরীক্ষার সময় শায়খুল হাদিস জাকারিয়া কান্ধলভি ঘোষণা দেন, 'যে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করবে তাকে এক সেট বজলুল মাজহুদ উপহার দেওয়া হবে।' তিনি ভারত, পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানের ছাত্রদের পরাভূত করে এই পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৮১ সালে শায়খুল হাদিস জাকারিয়া কান্ধলভির সাথে মদিনায় তার সাক্ষাৎ হয়, শায়খুল হাদিস তাকে স্বলিখিত সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ উপহার দেন।

উপমহাদেশে তার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে : শাহ আব্দুল ওয়াহহাব, মুফতি মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, ইজাজ আলি আমরুহি, ইব্রাহিম বলিয়াভি, মুফতি মুহাম্মদ শফী, কারি মুহাম্মদ তৈয়ব, শায়খুল হাদিস জাকারিয়া কান্ধলভি, জামিল আহমদ থানভিসহ খ্যাতিমান ব্যক্তি।

কর্মজীবন : শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ১৯৩০ সালে আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলামে হাদিসের অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবনের সূচনা করেন। পরবর্তীতে কিছুদিন সহকারী মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৪৫ সালে তিনি চকরিয়া শাহারবিল আনওয়ারুল উলুম মাদরাসায় যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি চকরিয়া কাকারা ইসলামিয়া মাদরাসায় চলে যান। ১৯৫৩ সালে তিনি নিজ গ্রাম বড়ইতলীতে মুফতি মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহর নামে 'ফয়জুল উলুম মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি এই মাদরাসার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে আজিজুল হকের আহ্বানে তিনি আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার অনুবাদ ও রচনা বিভাগের প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি শায়খুল হাদিস হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত প্রায় ১৭ বছর আমৃত্যু এই পদে বহাল ছিলেন। পাশাপাশি তিনি আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের প্রায় চার বছর সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত জামিয়া পটিয়ার শিক্ষা সচিব ছিলেন।

রাজনীতি : তিনি সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে পাঠ বন্ধ করে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি এ সময় খেলাফত আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৪০ সালে হুসাইন আহমদ মাদানির নেতৃত্বাধীন জমিয়ত উলামায়ে হিন্দে যোগদানের মাধ্যমে তার আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক পদযাত্রার সূচনা হয়।

১৯৪৮ সালে তিনি ও আশরাফ আলী ধরমন্ডলী কলকাতায় হুসাইন আহমদ মাদানির সাক্ষাৎ লাভ করেন। মাদানি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে পাকিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার পরামর্শ দেন।

১৯৫২ সালে তিনি শাব্বির আহমদ উসমানির নেতৃত্বাধীন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা আইনসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন লাভ করেন। পরবর্তীতে যুক্তফ্রন্ট তার মনোনয়ন বাতিল করলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কক্সবাজার-মহেশখালী-কুতুবদিয়া আসন থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

সাথে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে এবং সে মতপার্থক্য পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে। তবে আমরা সে সব মতবিরোধ রাজনীতিতে টেনে আনতে চাইনি। তাছাড়া আমরা মনে করেছিলাম, মতবিরোধ তো মাওলানা মওদুদির সঙ্গে। এরা জামায়াতে ইসলামী করেছে বলে তো আর মওদুদি হয়ে যায়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা আমাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণ করে নিজেদের মওদুদি মতবাদের অনুসারী হিসেবে প্রমাণ করেছে ও প্রচার কাজে নিয়োজিত রেখেছে। তাদের সাথে কৌশলগত বিরোধ এখানে যে, তারা ক্যাডারভিত্তিক সংগঠনে বিশ্বাসী আর আমরা ইসলামি আদর্শ ও উদার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।'

মুসলিম পারিবারিক আইন : প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলে 'মুসলিম পরিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১' জারি হয়। তিনি এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৬৩ সালের মার্চে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে তিনি বলেন, 'কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী এই আইনটি জোরপূর্বক আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোরআনে বিয়ের জন্য বয়সের কোনো সীমা নির্ধারিত না থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য আইনে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর সম্মতিক্রমে সংঘটিত ব্যভিচারের জন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই। অথচ শরিয়ত অনুযায়ী বৈধ পন্থায় বিয়ে হলে সে জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এদিকে দ্বিতীয় বিয়ের বিরোধিতা করা হয়, অন্যদিকে নারী-পুরুষের নৈতিকতাবিরোধী অবৈধ মেলামেশার পথে কোনো বাধা থাকছে না।'

জন্মনিয়ন্ত্রণ : তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অনৈতিক পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের জোর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি জনসংখ্যাকে আপদ মনে না করে তা জনশক্তিতে রূপান্তরের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে ছিলেন। তখন তাঁর একটি কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তিনি সরকারকে লক্ষ করে বলতেন : 'আগে ডেট কন্ট্রোল করুন, তারপর আমরা বার্থ কন্ট্রোল করব।'

অবদান : সে সময়ে ইসলাম বিষয়ক পণ্ডিতদের মধ্যে আরবি ও উর্দু ব্যাপকভাবে চর্চিত হলেও বাংলা ও ইংরেজি চর্চা ছিল খুবই সীমিত। তিনি নিজ উদ্যোগে বাংলা ও ইংরেজি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং যুব সমাজকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত করতেন। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলা আইনসভায় ৩ ভাষায় বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকলেও তিনি সব সময় বাংলায় বক্তব্য রাখেন এবং বিতর্কে অংশ নেন। তিনি 'আঞ্জুমানে তাহাফফুজে ইসলাম' নামক একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এই একাডেমির মাধ্যমে কোরআন ও হাদিস সংবলিত বহু বই প্রকাশ করেছিলেন। আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আজিজুল হক মাতৃভাষায় ইসলামি সাহিত্য চর্চার নিমিত্তে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করলে তিনি একাডেমির পরিচালক নিযুক্ত হন। কওমি মাদরাসাগুলো যেন মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব দেয় সেজন্য কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের এক ইশতেহারে তিনি বলেন, 'দরসে নিজামিতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব নেই। এ কারণেই আমাদের কওমি মাদরাসাসমূহের ফারেগ (উত্তীর্ণ) ছাত্ররা বিশুদ্ধ বাংলা না বলতে পারে আর না লিখতে পারে! অথচ আমাদের শ্রোতা বা পাঠকগণের অধিকাংশের ভাষা বাংলা। এর ফলে ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য তাবলিগ ও দাওয়াতের পরিধি অধিক থেকে অধিক সংকুচিত হয়ে পড়েছে।' বাংলা চর্চা, কথ্য ও লিখিত আরবি ভাষার উৎকর্ষের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ইসলামি জ্ঞানে পারদর্শী ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগচাহিদার প্রতি সংগতি রেখে তিনি একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলন : পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে তিনি এর বিরোধীতা করেন এবং বিভিন্ন মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এ সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা সৈয়দ মুছলেহ উদ্দিন, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী,

আবদুর রহীম[৮] সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং এডভোকেট শফিকুর রহমান

মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, মৌলভী ফরিদ আহমদ, মাওলানা ছিদ্দিক আহমদসহ গুরুত্বপূর্ণ আলমদের নেতৃত্বে গঠিত নেজামে ইসলাম পার্টি ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করেছে।' ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ১৯৫২ সালে কিশোরগঞ্জের হয়বতনগরে তার রাজনৈতিক দল জমিয়ত উলামায়ে ইসলামের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা প্রসঙ্গে।

কাব্যচর্চা : তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে তিনি ইসলামের জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপন করার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেরা বাগ্মীদের অন্যতম। বক্তব্য আকর্ষণীয় করার জন্য তিনি প্রায়শ জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি, শেখ সাদি, মহাকবি ইকবাল ও আকবর ইলাহাবাদির কবিতা উদ্ধৃত করতেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও কলা অনুষদের ডিন ড. শাব্বির আহমদ বলেন, 'মহাকবি ইকবালের চর্চা বাংলায় পরিলক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইকবালিয়াতের অন্তর্নিহিত জওক সমৃদ্ধ তাড়নার বাণী তিনিই সর্বাধিক সার্থকতার সাথে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন-মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করেন। তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্যের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে প্রাচীন প্রথায় এবং শিক্ষিত তরুণদের জন্য আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ রাহ. বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে আসেন জামির প্রেম, খসরুর পরমাত্মাগত জ্বালা ও রুমির তত্ত্বজ্ঞান। ইকবালের প্রেমাত্মা দর্শনে সিঞ্চিত খুদি বা ব্যক্তিসত্তায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি মানসের যোগসূত্র সাধনকর্ম বহুলাংশে আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ রাহ.-এর অব্যাহত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ স্বীকৃতিযোগ্য।'

খতিবে আজম উপাধি : তার বাগ্মিতার স্বীকৃতিস্বরূপ ফেব্রুয়ারিতে ফেনি আলিয়া মাদরাসা সংলগ্ন মিজান ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় খতিবে আজম ও খতিবে পাকিস্তান উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মৃত্যু : ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় সাড়ে তিন বছর রোগশয্যায় থাকার পর ১৯৮৭ সালের ১৯ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন বড়ইতলীতে দ্বিতীয় পুত্র সোহাইব নোমানির ইমামতিতে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার পর তার প্রতিষ্ঠিত ফয়জুল উলুম মাদরাসার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

৮. বিশ শতকের বাংলাদেশে যে কয়জন প্রাতঃস্মরণীয় ইসলামি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের শীর্ষে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম। তিনি এত আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন যে, নিজের নামের আগে মাওলানা উপাধি ব্যবহারেও কুণ্ঠা বোধ করতেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আলেম, বিজ্ঞ ফকিহ, চিন্তাবিদ, সুলেখক, বাগ্মী ও সাহিত্যিক এবং ছিলেন পার্লামেন্টারিয়ান, রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

মাওলানা আবদুর রহীম পিরোজপুরের শিয়ালকাঠিতে ১৯১৮ সালের ২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলহাজ্ব খবির উদ্দিন। নিজ এলাকায় প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলিকাতায় যান। ১৯৪২ সনে তিনি কলিকাতা আলিয়া হতে কৃতিত্বের সাথে মমতাজুল মুহাদ্দেসিন ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বরিশালের নাজিরপুর ও কেউন্দিয়া-কাউখালী মাদরাসায় প্রধান মাওলানা পদে চার বছর শিক্ষকতা করেন। কিন্তু বাঁধাধরা চাকরি তার পছন্দ নয় বলে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। বলা হয়, এর পর তিনি তাঁর সব সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেন এবং কলম যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাংলাদেশের আলেমদের মাঝে যে বিষয়টির অভাব পরিলক্ষিত হয়ে আসছিল তা হলো তাদের লিখিত কোনো অবদান তেমন একটা ছিল না। এ বিষয়টি তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং কলিকাতায় অধ্যয়নকালে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। আইডিএল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে কার্যত ইসলামি রাজনীতির যাত্রা শুরু হয়।

বিরুদ্ধে ইসলামি নীতিমালা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬৪ জন জামায়াত নেতাসহ তিনি কারাবরণ করেন। এর পর জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১-এর শেষ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত নেপালের কাঠমুন্ডুতে অবস্থান করে এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দেশের সব ইসলামি দল ও শক্তিকে একটিমাত্র দলে পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করে তিনি তার সহ-সভাপতি হন। পরের বছর তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচন হন। ১৯৭৯ সালে তিনিসহ ছয়জন দল থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন গঠন করেন। তিনি সর্বদা ইসলামি আন্দোলনকামীদের জোট সৃষ্টির মাধ্যমে গণ-আন্দোলন বিশ্বাস করতেন বলে দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' 'খেলাফত সংগ্রাম পরিষদ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর পর ১৯৮৭ সালের ৩ মার্চ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' আত্মপ্রকাশ করে। কয়েক মাসের মধ্যে দেশের সর্বত্র ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ আন্দোলনের প্রতিটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতেন। এজন্য পুলিশের নির্যাতনসহ নানাভাবে হয়রানির সম্মুখীন হয়েও তা তিনি হাসিমুখে বরণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল থাকেন।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। ইসলামি জীবনদর্শনের ওপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে তিনি তার দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ, কমিউনিজম ও সোশ্যালিজম, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ, আসমান-জমিনের সৃষ্টি রহস্য প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে তত্ত্ববহুল বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে *মহাসত্যের সন্ধানে, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব, কমিউনিজম ও ইসলাম, ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক। ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ সময়ে তিনি *মাসিক মোহাম্মদী* ও *আজাদ* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে তিনি *সাপ্তাহিক তানজিম* সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং এই দশকের শেষের দিকে *দৈনিক নাজাত* পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি *সাপ্তাহিক জাহানে নও*-সহ আরো অনেক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আবদুর রহীম ছিলেন গবেষক। তিনি তাঁর গবেষণার মাধ্যমে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বাংলা ভাষায় ইসলামি জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবে সৃষ্ট বহু যুগ জিজ্ঞাসার সমাধান পেশ করেছেন এবং যেকোনো মতবাদ বা মতাদর্শের ওপর ইসলামি জীবনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

তিনি ছিলেন আদর্শবাদী লেখক। তিনি যা পড়েছেন, গবেষণা করেছেন, তা তার ক্ষুরধার মসিতে প্রকাশ করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। সেই যে কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন, আমৃত্যু তিনি সেই সাধনা জারি রেখেছিলেন। ১৯৪৩-১৯৮৭ পর্যন্ত সময়ে তিনি বিরামহীন লিখেছেন।

তিনি মৌলিক ও অনুবাদসহ মোট ৮৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাঁর সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮টি এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত। তিনি ১৯৮৭ সনের ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ঢাকার রাশমনো হাসপাতালে দুপুর ১২.২০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন।

১৯৮৬ সালে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের অধীনে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ-বিষয়ক বিতর্কে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে যায়। খেলাফত আন্দোলনের ব্যানারে হাফেজ্জী হুজুর এ নির্বাচনে অংশ নেন।

১৯৮৭-র ৩ মার্চ মাওলানা আবদুর রহীম ও চরমোনাইর পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীমের নেতৃত্বে কয়েকটি ইসলামি দলের সমন্বয়ে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে একটি জোট গঠিত হয়। ইসলামি গণবিপ্লব সৃষ্টির লক্ষ্যে এ জোট স্বল্পস্থায়ী কিন্তু ব্যাপক মাত্রার আন্দোলন পরিচালনা করে। দাবি করা হয়, মাওলানা আবদুর রহীমের ইন্তেকালের (১ অক্টোবর ১৯৮৭) ফলে এ জোট স্তিমিত হয়ে পড়ে।[১০] অবশ্য বাস্তবে ১৯৯১-র পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করিম ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনকে একটি দলে রূপ দিয়ে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ-বিষয়ক ভিন্নমতের প্রেক্ষাপটে হাফেজ্জী হুজুরের দল খেলাফত আন্দোলন থেকে তার দীর্ঘদিনের সহচর ও সহকর্মী শায়খুল হাদিস আজিজুল হক ও মাওলানা আবদুল গাফ্ফারের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীদের একটি অংশ প্রথম পর্যায়ে 'খেলাফত আন্দোলন (আজিজ-গফ্ফার)' নামে পৃথকভাবে কার্যক্রম চালাতে থাকেন। শায়খুল হাদিসের নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলন ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর ইসলামী যুবশিবিরের সাথে যুক্ত হয়ে 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস' নামে একটি দল গঠন করে। স্মরণ করা যেতে পারে, জামায়াতে ইসলামীর সাথে আন্দোলন ও কর্মপদ্ধতির বিষয়ে কিছু নীতিগত ভিন্নতার কারণে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কিছু সাবেক নেতা-কর্মী মিলিত হয়ে ১৯৮২ সালে ইসলামী যুবশিবির গঠন করেছিলেন।

বঙ্গে ইসলামি রাজনীতি চর্চার সূচনা

১৯৪৫ সালে কলকাতার মোহাম্মদ আলি পার্কে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানির আহ্বানে এক ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের সহগামী ও অখণ্ড

[১০]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২৩।

২য় খণ্ড

পঁচাত্তর থেকে শাপলা

মনযূর আহমাদ

প্রকাশনায়
কাতেবিন প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৭৬ ৫৯৯৩২৪

অর্পণ

শহিদ সাইয়্যেদ নেসার আলি তিতুমির
আমাদের মহান পূর্বপুরুষ
আত্মসত্তা, অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে
হার না মানা এক মরণজয়ী বীর

শাহ আহমদ শফী
এক নির্ভীক কাণ্ডারী
হতাশায় নিমজ্জিত বাংলাদেশের মুসলিমদের
চরম দুঃসময়ে
ঈমানের চেতনায়
ঝলসে ওঠা এক মহান কীর্তিপুরুষ

▶ **ইসলামবিদ্বেষের সিলসিলায় সেক্যুলারিজম ।৪৩**
▶ ধর্মীয় পরিচয়, ইসলাম ও জাতিরাষ্ট্র তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা ।৪৫
▶ কৃষকের জমি পাওয়ার সংগ্রাম আর প্রজা মুসলিমের মুক্তির লড়াই ।৫১
▶ আত্মপরিচয়, ইসলাম ও বাঙালি মুসলিমের রাজনীতি ।৫৯
▶ মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ধর্মনিরপেক্ষতার আগমন ।৬২
▶ সংবিধানের চার নীতি স্বাধীনতার লক্ষ্য নয়; বরং আরোপিত ।৬৮

▶ **মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনা ।৭৯**
▶ আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী দলিলে ইসলাম ।৮৪
▶ সরকারের যুদ্ধ কৌশলের দুর্বলতা ও অসংগতি ।৯২
▶ গ্লোবাল যুদ্ধে কৌশল বদল ।৯৪
▶ শেখ হাসিনা ও নির্মূল কমিটির পরিপূরক সম্পর্ক ।৯৬
▶ অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে শাহরিয়ারের যুদ্ধ প্রস্তাব ।৯৯

▶ **রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামবিদ্বেষের উত্থান ।১০৩**
▶ পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামবিদ্বেষ ।১০৩
▶ (৪) বাংলাদেশে ইসলামোফোবিয়া ।১০৫
▶ শরিয়া ল' ।১০৬
▶ শরিয়া ল' ও ব্রিটিশ আইন কী? ।১০৭
▶ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ।১০৯
▶ ১. কাওয়ালি ও ইসলামোফোবিয়া ।১০৯
▶ ২. পোশাক সংস্কৃতি ।১১০
▶ ৩. নেপাল-বাংলাদেশ ফুটবল ম্যাচ ঘিরে ইসলামবিদ্বেষ ।১১২

▶ **হেফাজতের দার্শনিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সিলসিলার অনুসন্ধান ।১১৩**
▶ পাকিস্তান : ইসলামি রাষ্ট্রের স্বপ্নভঙ্গ ।১১৩
▶ মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশে ইসলাম প্রশ্ন ।১১৪
▶ ছয় দফা : শাহবাগের স্বরূপ সন্ধানে ।১১৫
▶ তেরো দফা : ভেতর-বাহির ।১১৯

- তেরো দফা : সাধারণ পরিসংখ্যান । ১২২
- তেরো দফা : দলগুলোর প্রতিক্রিয়া । ১২৩
- শাপলার পক্ষ-বিপক্ষ : ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব । ১২৪
- আধুনিক রাষ্ট্র ও ধর্মীয় নেতৃত্ব । ১২৮

ইসলাম ব্যাখ্যার নতুন বয়ান নারীবাদের সাতকাহন । ১৩৪
- নারী, নারীবাদ ও ইসলামি নারীবাদ । ১৩৬
- কথা হচ্ছে... । ১৪৪

রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' । ১৪৬
- রাজনীতি । ১৪৭
- শিক্ষাঙ্গন । ১৪৮
- ৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন । ১৫০
- ৪. ভিন্ন এক চিত্র । ১৫২

একজন গবেষকের চোখে বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতির সাফল্যের সম্ভাবনা । ১৫৭
- সবার আগে আমার জীবনের ছোট্ট একটি পর্যবেক্ষণ । ১৫৮
- ২৫ বছর ফাস্ট ফরওয়ার্ড । ১৫৮
- আবার । ১৫৮
- এই ঘটনাটা কীভাবে ঘটল । ১৬০
- কিন্তু । ১৬৩
- কিন্তু যদি এমন হয় । ১৬৩
- এগুলো কী? । ১৬৪

পঞ্চম অধ্যায়

অন্যরকম জাগরণ । ১৬৭
বাংলাদেশের অন্তর্গত শক্তির আধার । ১৭৩
তরুণ প্রজন্মের খতিয়ান । ১৭৯
এই তো আমার পরিচয় । ১৮২
ভেতর থেকে দেশ পাল্টে গিয়েছে । ১৮৪

- হেফাজতের গাড়িবহর । ৩১৬

- **দিবানিশির হরতাল । ৩১৯**
- **প্রস্তুত ঢাকা : পথে পথে গ্রেফতার বাধা হামলা । ৩২১**
- **'নিশিকুটুম্ব সিঁধেল চোর রাতের হরতালকারীদের কী নামে ডাকব' । ৩২৩**
- **অরাজনৈতিক মহাসমাবেশের রাজনৈতিক প্রভাব । ৩২৬**
- **হেফাজতের অর্জন ও বিসর্জনের খতিয়ান । ৩৩২**
- **শাপলা চত্বরে শায়খুল ইসলাম শাহ আহমদ শফীর পক্ষে পঠিত ভাষণ । ৩৪৭**
- **শাহ আহমদ শফীর কারিশমা ও হেফাজত । ৩৫২**
  - বিউপনিবেশায়ন অভিযাত্রার তাৎপর্য । ৩৫২

- **লংমার্চের ডাক : এক আল্লাহ জিন্দাবাদ । ৩৫৬**
- **শাহ আহমদ শফী রাহ.-এর চিন্তা ও দর্শন । ৩৬৭**
  - শিক্ষা-ভাবনা । ৩৬৭
  - বিভাজন শুরু হলো কখন? । ৩৭৩
  - রাজনৈতিক চিন্তাধারা । ৩৭৯

- **শাপলা ট্র্যাজেডির অন্দরে । ৩৮৯**
- **ওভাবে অভিযান না চালালে কি চলত না? । ৩৯৪**
- **বেদনার দুঃসহ ভার । ৪০১**
- **সংশয় নিরসনে খোলা চিঠি । ৪০৩**
- **আহা তাচ্ছিল্য! । ৪০৭**
- **কিছু প্রশ্ন । ৪১০**
- **দেশি-বিদেশি মিডিয়ায় হেফাজতের সংবাদ । ৪১২**
  - মিডিয়ায় হেফাজতে ইসলামের অভ্যুদয় । ৪১২
  - শাহবাগ বনাম হেফাজতে ইসলাম । ৪১৪
  - লংমার্চের ঘোষণা বদলে দিয়েছে পত্রিকার জমিন । ৪২০
  - শাপলা চত্বরের সমাবেশ ও দেশীয় মিডিয়ার কারচুপি । ৪২৩
  - হেফাজতের হরতাল ও প্রথম আলোর মিথ্যাচার । ৪৩১

- **আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে লংমার্চ : নজিরবিহীন কভারেজ । ৪৩৫**
  - আল জাজিরা । ৪৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

রক্তাক্ত পঁচাত্তর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে তিনি বিজয়ী নায়ক রূপে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সমযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচয় নির্মাণে তাঁর চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। শেখ মুজিব ছিলেন সেই ব্যক্তি, জীবনব্যাপী যিনি এই জাতির স্বার্থে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিরাজ করেছিলেন এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তার প্রতীক, যা এক সর্বব্যাপী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সোপান রচনা করেছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যতই পরিবর্তন আসুক না কেন, আর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পটপরিবর্তনের যত খেলা চলুক না কেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধানতম নেতার আসন থেকে শেখ মুজিবকে বিচ্যুত করা অসম্ভব বিবেচিত হবে। যেকোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোয় ভিত গড়ুক না কেন, বা এদেশে যেকোনো মত ও পথের সরকার ক্ষমতায় আসীন হোক না কেন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে চিরদিন শেখ মুজিবের কীর্তি অমলিন হয়ে থাকবে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, একজন মানুষ হিসেবে শেখ মুজিবের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে দুর্বলতা ছিল, স্ববিরোধিতা ছিল। তাই তাঁর অবদানের হরেদরে ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয় নয়। শেখ মুজিবকে বুঝতে হলে তাঁর ভূমিকাকে দুভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথম ভাগ ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি অবধি এবং পরবর্তী ভাগ ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি। প্রথম অংশে আমরা দেখতে পাই, বঙ্গবন্ধু অব্যাহতভাবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রত্যয়ে একের পর এক কর্মসূচি ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। তিনি কাজ করেছেন একজন বুর্জোয়া উদার গণতন্ত্রী হিসেবে এবং তার ধারণা সবসময় গণতান্ত্রিক কাঠামো ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। দুঃখজনক যে তিনি পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ফলে তিনি নিজেকে একজন সোশ্যাল ডেমোক্রেট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ কথাও সত্য, তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে শিকড়-সচেতন প্রবীণদের অগ্রাহ্য করে অপরিণামদর্শী ও ক্ষমতা-বিলাসী নবীন ও যুবকদের প্রভাবে দিক বদল করেছিলেন। এই শিকড়চ্যুত যুবশক্তির ধারণার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে তাকে পদে পদে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার আচরণ ও অভ্যাসে পরিলক্ষিত হয় যে তিনি সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনার টেবিলে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া অধিকতর শ্রেয়ঃ মনে করতেন। শেখ মুজিব ছিলেন এমন একটি মধ্যপন্থি দলের নেতা, যার সদস্যদের অধিকাংশ ছিলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির অসংখ্য লোকের অসমসত্ব মিশ্রণ, দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল। পাকবাহিনী ধংসযজ্ঞ শুরু করার পর শেখ মুজিব সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। গোটা স্বাধীনতা যুদ্ধকালে শেখ মুজিব ছিলেন অনুপস্থিত এবং যুদ্ধে তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়াই তা তার নিজস্ব শ্রোতমুখে প্রবাহিত হয়েছে।

তবে শেখ মুজিবের জীবনকর্মের প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল বিজয় গৌরবে উদ্ভাসিত। ক্ষেত্রবিশেষে পথবিচ্যুত হয়ে তিনি প্রচলিত ধারার পরিপন্থি কাজ করলেও শেষপর্যন্ত তিনি আপস করেননি; এবং উপর্যুপরি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের নায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর নামেই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এবং সে যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে। সর্বশেষে, পাকিস্তানি বন্দিদশা থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' 'জাতির পিতা' ও সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

হয়েছিলেন। তারা ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আরোহণের ঘটনার সঙ্গেই এর তুলনা করেছিলেন। দেশের মানুষও যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল এবং তার ফলে একটি সার্বভৌম দেশকে বিভক্ত করে আরেকটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছিল, এ কথা বোধহয় ভারা ভুলেই গিয়েছিল। অন্যদিকে, শেখ মুজিব বারংবার দেশের অস্থিতিশীলতার জন্য 'দালাল' ও 'সশস্ত্র' গেরিলাদের দায়ী করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর দলের অসৎ, লোভী, উচ্চাভিলাষী লোকেরাই এই দুঃসহ অবস্থা সংঘটনের জন্য দায়ী ছিল।

শেখ মুজিবের আরেকটি দুর্বলতা ছিল, আওয়ামী লীগ সরকার ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন। সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হলেও আওয়ামী লীগের প্রতি ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনেই তাদের ক্ষমতায় আরোহনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছিল। প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিব নিজেকে লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে ইতোমধ্যেই দুই দেশের সরকারের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ভারতের অধঃস্তন করে ফেলা হয়েছে। এই মায়াজাল ছিড়ে সহসা বাইরে বের হয়ে আসা শেখ মুজিবের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

দল নেতাদের কথা বাদ থাক, শেখ মুজিব তার আত্মীয়-পরিজনদেরও নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার সামন্তবাদী চরিত্র চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য ধরনের আত্মীয় ও চাটুকারের সমাবেশ ঘটানোর অনুকূলে ছিল। ফলে তারা সরকার ও দলের গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলো ভাগাভাগির মাধ্যমে দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। এ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা রাজনৈতিক প্রশাসনে দর্নীতি অনুপ্রবেশের পথ উম্মুক্ত করে। এর ফল দাঁড়ায়, শেখ মুজিব যখন দুর্নীতি, চোরাচালান ও সমাজবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে বারংবার হুঙ্কার দিচ্ছিলেন, তখন তিনি ভুলে যাচ্ছেন তার চারপাশের নিজ দলের লোকেরাই সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে দিনে দিনে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন ও অগ্রহণযোগ্য করে চলেছে।

ফলে তাঁর কোনো পদক্ষেপই ইতিবাচক ফলাফল বহন করে আনতে পারেনি। শেখ মুজিব স্বয়ং অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক তদবির কিংবা আত্মীয়স্বজনের প্রভাবে অপরাধীর জন্য পর্যাপ্ত শাস্তিবিধান সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমন কি

এ কথা সত্য যে, যেকোনো রকমের সংস্কারমূলক পরিকল্পনাই একধরনের কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের স্বার্থের ওপর আঘাত হানে এবং তারা নিজেদের বিদ্যমান অবস্থা বহাল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। নিজেদের শ্রেণি স্বার্থ ও মুনাফার অঙ্ক বহাল রাখার জন্য তারা যেকোনো সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে থাকে। তাই এ কথা ঠিক যেকোনো সংস্কারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার সুফল সাধারণ জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা অবধি অন্তবর্তীকালীন সময়টি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। কাজেই যেকোনো ধরনের সংস্কারের যথাযথ মূল্যায়ন করতে গেলে তার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহের সুফল পাওয়া পর্যন্ত যে সময়ের প্রয়োজন ছিল, সে সময়টুকু তিনি পেয়েছিলেন না। বরং এই পদক্ষেপসমূহ তার দলের একধরনের নেতাসহ একটি শক্তিশালী শ্রেণিবিশেষের স্বার্থে বিপর্যয়ের সূচনা ঘটিয়ে ছিল। তারা এই সংস্কারের সর্বাত্মক বিরোধিতা করছিলেন।

এই শ্রেণিটিকে নিবৃত্ত রাখা কিংবা সংস্কারের ফলে লাভবান হবেন, এমন শ্রেণিকে সচেতন করে জনমত সৃষ্টি করা শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব হয়ে ছিল না। ফলে এই ব্যর্থতার দায়ভার বহন করা তাঁর জন্য ছিল এক স্বাভাবিক অপরিহার্য পরিণতি।

শেখ মুজিবকে একজন মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত না করা গেলেও তার সহজাত বিবেচনাবোধ এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ। মাঝে মাঝে তাঁর মানবিক আচরণ, দয়া ও সহানুভূতি-প্রবণতাকে অতিরিক্ত বলে মনে হতো। গুরুতর অপরাধ করলেও তিনি অপরাধীকে অবলীলায় ক্ষমা করে দিতেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অথবা দালালির অভিযোগে আটক লোকদের পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের অন্নবস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। আসলে তাঁর আচার-আচরণে বাঙালির আবহমান কালের কোমল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলেও নিজের ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাসের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি ছিলেন জাতীয়তার প্রতীক এবং নিঃসন্দেহে একজন দেশপ্রেমিক। নতুন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণকে স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে এগিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর কর্মসূচির মূলমন্ত্র। হয়তো একজন প্রশাসক হিসেবে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এ অবস্থার জন্য তিনি নিজে যতটা দায়ী ছিলেন, তাঁর

দলের লোকদের লোভ-লালসা, তাদের শ্রেণিচরিত্র, দলীয় নেতৃত্ব হিসেবে কাজ চালানোর ক্ষেত্রে তাদের অযোগ্যতা এবং ৯ মাসের বিধ্বংসী সংগ্রাম শেষে উদ্ভূত দেশের বিদ্যমান ভগ্নদশা দায়ী ছিল তার চাইতে অনেক বেশি।

জাতীয়তাবাদী একজন নেতা হিসেবে বাংলাদেশকে ভারতের তীব্র প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে তিনি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন ঠিকই কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তীব্র অসন্তোষের মুখেও তিনি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ভুট্টোকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে বাদশাহ্ খালেদকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং আরো কয়েকটি দেশে সফর করে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনর্বহাল করে আরব বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ বহুলাংশে বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই সাথে তিনি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন।

১৯৭৪ সালে তিনি বাংলাদেশ সাহায্যদাতা গোষ্ঠী গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারকে বাংলাদেশে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক নীতিমালায় রদবদল ঘটিয়ে তিনি বাংলাদেশে বিদেশি ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাংকের সভাপতি ম্যাকনামারাকে বাংলাদেশে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশে ম্যাকনামারার সফরের পাশাপাশি তিনি চীনে দূত প্রেরণ করে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। সরকারের অভ্যন্তরে ভারত-সোভিয়েত প্রভাব হ্রাসের জন্য তাজউদ্দিন আহমদকে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করেছিলেন। জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন করে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি হেরাত ফোর্ডের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সবকিছু বিচার করলে দেখা যায় যে তিনি ধীরে ধীরে একটি নিরপেক্ষতাবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে জাতীয়তাবাদী একজন নেতা হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

পর তিনি যদি অবসর নিতেন, তাহলে হয়তো মুজিব তাঁর ভাবমূর্তি অনেক উচ্চতর এক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের ছকে বাধা রাজনীতির অনুসরণেই ব্যাপক জনপ্রিয়তার মোহ শেখ মুজব এড়াতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবং রাষ্ট্রপ্রশাসনে কঠোর বাস্তবতার মুখোমখি হয়ে তিনি প্রকারান্তরে নিজের ভাবমর্যাদাই বিনষ্ট করেছিলেন।

স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, অমরতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও শেখ মুজিব তা অর্জন করতে পেরেছিলেন না। তবে তার মৃত্যু ছিল মহিমান্বিত।

অত্যন্ত দুঃখবহ এবং করুণ মৃত্যু ঘটলেও তিনি একটি মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন, একটি নতুন জাতিসত্তা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। নিজের আপনজনের হাত থেকে এই অমোঘ মৃত্যুবাণ বর্ষিত হলেও এ মৃত্যু কি নিঃসন্দেহে তাকে শহিদের মর্যাদা দেয় নি? বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই তো শেখ মুজিব তার প্রাণপ্রিয় বাসভূমিতে ফিরে এসেছিলেন।

রক্তাক্ত পঁচাত্তর এবং 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ!'

১৫ আগস্ট বিয়োগান্ত ঘটনার পর সকালে ডালিম বেতারে ঘোষণা দেয়, 'মুজিবকে' হত্যা করা হয়েছে এবং খন্দকার মোশতাকের অধীনে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। ডালিম আরো বলে, দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে এবং এখন থেকে বাংলাদেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হবে।'

ডালিমের ঘোষণা ছিল এ রকম :

> আমি মেজর ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে এবং সারা দেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ এখন থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র।[১]

খন্দকার মোশতাকের ওই দিনের ভাষণেও জনগণ ধারণা করেছিল, দেশে ইসলামি শাসন কায়েম হতে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি তার ভাষণের পর এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা থেকে বিরত ছিলেন।

---

১. বিডি নিউজ প্রকাশিত অমি রহমানের নিবন্ধ, ২৮ জানুয়ারি, ২০১২।

এই কূটনৈতিক নোটে লেখা ছিল : 'যদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করা হয় এবং কোনো দেশের সঙ্গে কনফেডারেশন করা হয়, তাহলে ভারতের কাছে থাকা বৈধ চুক্তির আওতায় ভারতের সেনাবাহিনী যথ াযথ পদক্ষেপ নেবে।'

এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, খন্দকার মোশতাক এবং পরবর্তীতে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন তারা ভারতের কূটনৈতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা থেকে বিরত ছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধির বিবৃতি

পঁচাত্তরের ২০ আগস্ট সমর সেন খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গেও দেখা করেন। ওইদিনই বিকেলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের চার্জ-দ্য-অ্যাফেয়ার্স বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরদিন ২১ আগস্ট বৃহস্পতিবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি কায়রোর দৈনিক আল-আহরাম পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে গান্ধী বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, 'ভারত বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে মুক্তিযুদ্ধের পরে যেসব আদর্শের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছে, সে সব আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে কাজ করতে হবে।'

অর্থাৎ, তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বলেছেন, বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখতে হবে। বাংলাদেশেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না এবং পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো প্রকার কনফেডারেশন করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করেন, খন্দকার মোশতাকের সরকার যে পাকিস্তান বা অপর কোন দেশের সঙ্গে কনফেডারেশন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার কি কোনো প্রমাণ আছে? কোনো প্রমাণ না থাকলে অযথা

তবে মানস ঘোষ তার নিবন্ধে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে শ্রী সমর সেনের সাক্ষাৎকারের তারিখ ১৮ আগস্ট উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়। শ্রী সেন খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ২০ আগস্ট, বুধবার।-লেখক